Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার উর্মি

রোলঃ 23090120495

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা আক্তার উর্মি

রোলঃ 23090120495

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা আক্তার উর্মি, আইডিঃ 23090120495 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর ওপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফারজানা আক্তার ঊর্মি

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফারজানা আক্তার উর্মি

আইডিঃ 23090120495

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অধ্যায় ১:পরিবার 6

অধ্যায় ২:মুসলিম পরিবার ও পারিবারিক কাঠামো 8

অধ্যায় ৩:সংস্কৃতি 30

অধ্যায় ৪:ইসলামি সংস্কৃতি 33

অধ্যায় ৫:পশ্চিমা সংস্কৃতি 35

অধ্যায় ৬:মুসলিম ও পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর তুলনা 38

অধ্যায় ৭: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার 40

অধ্যায় ৮: পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির তুলনা 42

অধ্যায় ৯: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব 44

অধ্যায় ১০:পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব কাটিয়ে উঠার উপায় 47

References 49

বিষয় :মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব।

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য;যিনি এক ও অদ্বিতীয়; সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা।দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

পরিবার হলো প্রথম শিক্ষালয় ও নৈতিকতার কেন্দ্র। পরিবার থেকেই মূলত শিক্ষার বিস্তার ঘটে।ইসলামে প্রথমে নিজের পরিবার থেকে দ্বীন কায়েমের কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি যে,নবীজী (সা.) প্রথমে তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে প্রকাশ্যে সকল মানুষের নিকট ইসলামকে তুলে ধরেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।(আর-রূম:২১)

এ থেকে পরিবারের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তবে বর্তমান সময়ে মুসলিম পরিবারগুলো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত;অন্যভাবে বলা যায়, পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত,যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আর এ কারণেই ইসলাম ও পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা এখন সময়ের দাবি।পশ্চিমাদের সকল ক্ষেত্রে তথাকথিত মুক্ত ও উদারমনা ধারণাগুলো(যেমন:একক পরিবার,ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীবাদ প্রভৃতি) মুসলিমদের মূল্যবোধকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন করে ফেলছে,যা মুসলিম পরিবার তথা সমাজের স্থিতিশীলতা, মূল্যবোধের জন্য হুমকি।পশ্চিমা সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের ফলে মুসলিম তরুণ প্রজন্ম তাদের অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং এতে মুসলিমদের পারিবারিক কাঠামো ও ধর্মীয় চেতনা দূর্বল হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে মুসলিমরা নিজেদের স্বকীয়তা হারাবে।মুসলিম পরিবার রক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্কে জানা;পশ্চিমা সংস্কৃতির কুপ্রভাব বুঝতে পারা ও এর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য এসকল বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

অধ্যায় ১:পরিবার

পরিবার হলো সমাজ তথা রাষ্ট্রের মূলভিত্তি বা মৌলিক একক।সাধারণত পরিবার বলতে বুঝায় রক্ত সম্পর্ক বা বিবাহের দ্বারা আবদ্ধ লোকদের সমষ্টি, যারা একত্রে বসবাস করে এবং পারস্পরিক দায় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে।পরিবার হচ্ছে সগোত্রতা বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দ্বারা সম্পর্কিত ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠী। এটি সামাজিক নিয়মের ভিত্তি। ঐতিহাসিকভাবে বেশিরভাগ মানব সমাজ পরিবারকে স্নেহ, প্রতিপালন ও সমাজবদ্ধতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহার করে।নৃবিজ্ঞানীরা বেশিরভাগ পরিবারকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করেছে:
পরিবারের কর্তা বা প্রধান ব্যক্তির বিবেচনায়,

- **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার**

এ পরিবারে পিতাই পরিবারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এবং পরিবারের সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতার অধীকারী হয়ে থাকেন।পিতার মাধ্যমেই সন্তানেরা বংশ পরিচয় লাভ করে এবং পিতার নিকট থেকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে।আমাদের সমাজে বিদ্যমান অধিকাংশ পরিবারই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

- **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার**

এ পরিবারে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন মাতা।মাতা পরিবারের সকল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।এক্ষেত্রে বংশ পরিচয় ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার মাতার নিকট থেকে আসে।অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি (ওইডি) অনুসারে, "মাতৃতন্ত্র হল সামাজিক সংগঠনের এমন একটি রূপ যেখানে মা অথবা সবচেয়ে বয়স্ক মহিলা পরিবারের প্রধান শাসক হিসেবে থাকেন এবং বংশ ও সম্পর্ককে সেইসব নারীদের উত্তরসূরী হিসেবেই গণনা করা হয়।" বাংলাদেশের গারো,খাসিয়া উপজাতিদের পরিবার হলো মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

- **অণু পরিবার**

এ ধরনের পরিবার কেবল স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে।অণু পরিবারকে একক পরিবার বা পারমাণবিক পরিবারও বলা হয়ে থাকে।সাধারণত শহরাঞ্চলে এ ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়। তবে বর্তমান সময়ে সর্বত্র অণু পরিবারের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **যৌথ পরিবার**

এ পরিবার পিতামাতা, দাম্পত্য সঙ্গী ও সন্তানসন্ততি,দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, চাচাতো ভাইবোন সবাইকে নিয়ে গঠিত তথা কয়েকটি প্রজন্ম একসাথে বসবাস করার মাধ্যমে যৌথ পরিবার গড়ে তুলে।সাধারণত পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি যৌথ পরিবারের প্রধান হয়ে থাকেন এবং পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে থাকেন।বর্তমানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা অনেক কম।

"পারিবারিক কাঠামো" হল এমন একটি শব্দ যা বিবাহ বা রক্তের সূত্রে আবদ্ধ পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা করে এবং সাধারণত ১৮ বছরের কম বয়সী বাড়িতে বসবাসকারী কমপক্ষে একটি সন্তানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আজ এই কাঠামোগুলিকে দুই-পিতা-মাতা, এক-পিতা-মাতা এবং "কোনও পিতা-মাতার সাথে বসবাস" (যেমন, দত্তক পরিবার, দাদা-দাদী পরিবার বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, পালক পরিবার) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে পারিবারিক জীবনে অন্যান্য পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক কাঠামোর আরও জটিল উপাধি তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মিশ্র পরিবার, একক-পিতা-মাতা এবং অংশীদার পরিবার,বহু-প্রজন্মের পরিবার এবং দ্বি-পারমাণবিক পরিবার।সময়ের সাথে সাথে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দেখায় যে ১৯০০ সালের আগে বিবাহবিচ্ছেদ অস্বাভাবিক ছিল, তাই স্বামী/স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সাধারণত সৎ পরিবার তৈরি হত। এই ধরনের নবগঠিত সৎ পরিবারগুলিতে জীবিত অনাবাসিক পিতামাতার জটিলতা ছিল না, তাই সন্তানদের তাদের পিতামাতার পৃথক বাড়ির মধ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার আশা করা হত না।বাইনিউক্লিয়ার পরিবার" শব্দটি ১৯৭০-এর দশকে বিবাহবিচ্ছেদের পরিবারগুলিকে বোঝাতে তৈরি করা হয়েছিল যেখানে শিশুরা দুটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিবাহের বিলম্ব এবং বিবাহবিচ্ছেদ পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনের আরেকটি কারণ। বর্তমানে অ-বিবাহিত নারী-পুরুষের সম্পর্ক তথা মিলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এটি অস্বাভাবিক নয় যে এই ধরনের মিলনে শিশুরাও জড়িত।

বিশ্বব্যাপী পারিবারিক কাঠামোতেও একই ধরণের ধরণ দেখা যায়। যদিও দুই পিতামাতার পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, তবুও তারা বিশ্বজুড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাঠামো হিসাবে রয়ে গেছে। আমেরিকা, ইউরোপ, ওশেনিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার তুলনায় এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে এগুলি বেশি দেখা যায়। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ওশেনিয়া এবং বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায় নারী-পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের ঘটনার হার বেশি। দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপে বিবাহের বাইরে সন্তান ধারণ সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে কম দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকা (৭০ শতাংশ শিশু) এবং অন্যান্য অঞ্চলে (সাহারান আফ্রিকার উপ-সাহারান অঞ্চল এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশ) বর্ধিত পরিবার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

অধ্যায় ২:মুসলিম পরিবার ও পারিবারিক কাঠামো

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। পারিবারিক জীবন থেকেই গড়ে উঠে ইসলামী পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা।

পরিবারই শিশুর মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল।পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এজন্যই পবিত্র আল-কুরআন ও রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে পরিবার সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেছেন, যা থেকে আমরা পরিবার গঠন ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি।

“আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

একজন মুমিন ব্যক্তির নিকট নিজের পরিবারকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে অগ্রসর দেখতে পাওয়া অন্যান্য নেয়ামতের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন, "যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর”। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

মুসলিম পরিবারের অন্যতম ভিত্তি হলো পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও ভালোবাসা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে ভালো।"[ইবন মাজাহ ও হাকেম]

মুসলিম পারিবারিক কাঠামো বলতে ইসলামি নীতিমালা, যেমন কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা পরিচালিত একটি পরিবারকে বোঝায়, যার ভিত্তি হল স্বামী-স্ত্রী, সন্তান এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহযোগিতা। এই কাঠামোতে বিবাহ হলো মৌলিক একক, যা জৈবিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সমাজ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু আইন ও নিয়মকানুন, যেমন: বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

২.১:বিবাহ

পরিবারের মূল ভিত্তি হলো বিয়ে।মাওলানা মুহাম্মাদ আলী বলেন, The family which is the real unit of the human race and the first cohesive force which makes civilization possible, owes its existence solely to marriage. If there is no marriage, then there can be no family, no ties of kinship, no force uniting the different elements of humanity and consequently, no civilization.

তাই তো ইসলাম পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিয়ের নির্দেশ প্রদান করেছে।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘তোমরা যদি আশংকা কর যে, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে...’’ (সূরা আন নিসা, আয়াত ৩)

‘‘মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিয়ের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়।’’ (সূরা আল মায়িদা, আয়াত ৫)।

ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র বৈধ পন্থা হল বিবাহ। পরিবার গঠন, সংরক্ষণ ও বংশ-বিস্তারের জন্য বিয়ে ছাড়া আর কোন বিধি সম্মত পথ নেই। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পবিত্র ও কলুষমুক্ত হয়ে নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে।

আলক্বামাহ (রহ:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বলেছেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে এবং যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ‘সাওম’ পালন করে। কেননা, সাওম যৌন ক্ষমতাকে দমন করে।[বুখারি:৫০৬৫;[১৯০৫; মুসলিম ১৬/১, হাঃ ১৪০০, আহমাদ ৪০৩৩] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৯২, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৯৫)]

মহানবী (সা.) বলেন, ‘‘বিয়ে করা আমার সুন্নাত। সুতরাং যে আমার সুন্নাত বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।''

শুধু তাই নয়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিয়েকে ঈমানের অর্ধেক গণ্য করে বলেন, ‘‘যখন কোন বান্দা বিয়ে করে তখন সে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। কাজেই অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করুক।''

বিয়ে করা নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ বিয়ে করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।’’ (সূরা আর রা‘দ, আয়াত ৩৮)।

সাহাবি,তাবেয়ি,তাবে-তাবেয়ি,বরেণ্য ইমামগণও বিয়ে করেছেন। সাধারণভাবে বিয়ে করা সুন্নাত। তবে বিয়ের হুকুম সকলের ক্ষেত্রে একই রকম নয়। ব্যক্তি ভেদে তা ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মাকরূহ প্রভৃতি হয়ে থাকে।

ওয়াজিব : যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, বিয়ে না করলে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার নিশ্চিত আশংকায় নিপতিত হয় এবং মোহর ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ক্ষমতা রাখে তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য।

মুস্তাহাব : যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, কিন্তু ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ার ভয় করে না তার জন্য বিয়ে করা মুস্তাহাব।

মাকরূহ : স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে অক্ষম হওয়া, খারাপ ব্যবহার করা বা স্ত্রী সহবাসের ব্যাপারে আগ্রহ না থাকার কারণে বিয়ে করলে অন্যের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা হবে বলে যদি ভয় হয় তাহলে বিয়ে করা মাকরূহ।

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রি নির্বাচনের ব্যাপারে হাদিসে রয়েছে,

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। [বুখারি :৫০৯০;[মুসলিম ১৭/১৫, হাঃ ১৪৬৬, আহমাদ ৯৫২৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭১৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭১৯)]

ইমাম তিরমিযী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে।[তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৪]

ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।[আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩]

ইসলামি বিবাহ সাধারণত পারিবারিকভাবে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং সহজ পন্থায় হালালভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।স্ত্রীকে সম্মান ও অধিকার হিসেবে স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা প্রদান করে থাকেন।বিবাহের মাধ্যমে গড়ে উঠে মুসলিম পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র। বিয়ে ইসলামি শরীয়তের এক অনন্য ব্যবস্থা। এর তাৎপর্য ও উপকারিতা অপরিসীম। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:-

১) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। রক্তে-মাংসে

গড়া মানুষ তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য সদা উদগ্রীব থাকে। যদি সে তার মনোদৈহিক চাহিদা পূরণের অবকাশ না পায় তাহলে হতচকিত-বিচলিত হয়ে পড়ে এবং পাপের পথে ধাবমান হয়। এক্ষেত্রে বিয়েই একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা, যা তার দেহ-মনের চাহিদা পূরণ করে তাকে আত্মিক প্রশান্তি ও অনাবিল সুখানুভূতিতে অবগাহন করিয়ে ব্যভিচারের পথ থেকে নিবৃত্ত করে।

২) সন্তান জন্মদান ও বংশবিস্তার বিয়ের অন্যতম একটি উদ্দেশ্যে।

৩) দৃষ্টি সংযতকরণ, আদর্শ জাতি ও আদর্শ সমাজ গঠন এবং পৃথিবী আবাদ করার জন্য বিয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

৪) বিয়ের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হয় তা পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর মানবপ্রেমে মানুষকে উজ্জীবিত করে।

৫) বিয়ের ফলে স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি স্বামীর যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় তা তার কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে ও তার যোগ্যতা-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করে। সে তাদের জন্য উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৬) বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য লাভ করা যায় ও আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’’ (সূরা আন নূর, আয়াত ৩২)

৭) বিয়ের মাধ্যমে চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে জাতি রক্ষা পায়। সমাজে যেনা-ব্যভিচার ও অশ্লীলতা হ্রাস পায়।

৮) বিয়ে হচ্ছে মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্যবোধের একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। এখান থেকে মানুষ নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাজের মানুষের প্রতিও তার যে দায়িত্ব-কর্তব্য আছে সে ব্যাপারে সজাগ হয়।

৯) বিয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

২.২:স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, নেতাও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষও তার পরিবারের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীও

তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[তিরমিযী, হাদীস নং ১৭০৫]

স্বামীর ওপর স্ত্রীর বহু অধিকার রয়েছে।ইসলামে স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা এবং দয়াপরবশ হয়ে তাদের সকল আচরণ সহ্য করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো। "(সূরা আন নিসা: ১৯)

অপর জায়গায় তাদের অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তারা তোমাদের থেকে নিয়েছিল দৃঢ় অঙ্গীকার? " (সূরা আন নিসা:২১)

ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত ছিল তিনটা বিষয়। সেগুলো বলতে বলতেই তার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল।তিনি বলছিলেন :নামাজ কায়েম করো,নামাজ কায়েম করো। তোমরা যেসকল গোলাম ও বাঁদির মালিক তাদেরকে তাদের সাধ্যাতিত কাজ করতে বলো না। স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তারা তোমাদের হাতে বন্দি। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছ এবং তাদের লজ্জাস্থান আল্লাহর কালেমা উচ্চারণ করে হালাল করেছো।(মুসনাদে আহমাদ ;বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ:৭/২০৫)

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর অসদাচরণে সবর করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই পরিমাণ সওয়াব দেবেন, যে পরিমাণ হযরত আইয়ুব (আ.)-কে তাঁর বিপদের কারণে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী তার স্বামীর বদমেজাজিতে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফিরাউনপত্নী আসিয়ার সমান সওয়াব দান করবেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, স্ত্রীর সাথে সদাচরণের অর্থ স্ত্রী পিড়ন না করলে সদাচরণ করা নয় ;বরং অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর পিড়নের জবাবে সদাচরণ করা। স্ত্রী ল রাগ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণে তার রাগ সহ্য করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবিগন ও তাঁর সামনে রাগ করতেন এবং তাদের কেউ কেউ সারাদিন তাঁর সাথে কথা বলতেন না। তিনি এসব বিষয় নীরবে সহ্য করতেন এবং তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন না।

হযরত উমর (রাযি.) এর পত্নী একবার তাঁর কথার জবাব দিলে তিনি রাগতস্বরে বললেন, হে উদ্ধত, তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ।পত্নী বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবিগণও তাঁর কথার জবাব দেন; অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। হযরত উমর বললেন, হাফসা জবাব দিয়ে থাকলে সে খুব খারাপ করেছে। অতঃপর তিনি কন্যা হাফসাকে সম্বোধন করে বললেন, হে হাফসা, সিদ্দিকের কন্যা হবার লোভ করো না। হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদরিণী।তুমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার জবাব দেবে না।

একবার কোন এক কথায় রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশা (রাযি.) বললেন, আপনিই বলেন, আপনি পয়গম্বর। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুচকি এসে তা সহ্য করে নিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত

আয়েশাকে বলতেন, আয়েশা, আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝে নিতে পারি। তিনি আরজ করলেন, আপনি তা কেমন করে বুঝতে পারেন? তিনি বললেন যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, তখন কসম খেতে গিয়ে বলো, মুহাম্মদ (সা.) এর আল্লাহর কসম, আর রাগের অবস্থায় বলো ইবরাহিম-এর আল্লাহর কসম। আয়েশা (রাযি.) আরজ করলেন,আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কেবল আপনার নামটিই বর্জন করি (বুখারি:২২২৮;মুসলিম :২৪৩৯)

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন,রাসুলুল্লাহ (সা.) নারী ও শিশুদের প্রতি সবার তুলনায় অধিক দয়াশীল ছিলেন।

স্ত্রীর সদাচরণের একটি উপায় হলো, পীড়ন সহ্য করা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে হাসি-তামাশা ও আনন্দ করবে। এতে তাদের মন প্রফুল্ল হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়ম ছিল, তিনি বিবিদের সাথে ব্যঙ্গ কৌতুক করতেন এবং কাজে ও চরিত্রে তাদের স্তরে নেমে যেতেন। এমনকি বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন। একদিন হযরত আয়েশা দৌড়ে জিতে গেলেন। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ(সা.) দৌড়ে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, আয়েশা এটা সেদিনের প্রতিশোধ । (মুসনাদে আহমাদ :৬/৩৯,২৬৪)

এক হাদীসে বলা হয়েছে, মুমিনদের মধ্যে অধিক কামেল মুমিন সেই ব্যক্তি, যার অভ্যাস ভালো এবং সে পরিবার পরিজনের প্রতি অধিক কৃপাশীল। (তিরমিযি, নাসায়ি)

আয়েশা (রাযি.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে সে-ই ভালো যে তার পরিবারের নিকট ভালো। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চাইতে উত্তম। (আবু দাউদ:৪৮৯৯;তিরমিযি:৩৮৯৫)

হযরত উমর (রাযি.) কঠোরচিত্ত হওয়া সত্ত্বেও বলেন, পুরুষের উচিত নিজের ঘরে শিশুদের মতো থাকা। যখন তার কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয় তখন পুরুষ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে নারীদের উপর শাসক সাব্যস্ত করেছেন।

কুরআনে বলা হয়েছে, "আর তারা মহিলার শাসককে(স্বামী) দরজার কাছে পেল।(সূরা ইউসুফ :২৫)

স্ত্রীর কর্তব্য

স্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হলো স্বামীর আনুগত্য করা।তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন পাপের কাজে নির্দেশ প্রদান করে তাহলে স্ত্রী সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে; কখনো মানবে না।স্বামীর ধন-সম্পদ অযথা ব্যয় না করা;বরং সে স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করবে।স্বামীর আমানত রক্ষা করা, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে হিফাযত করা এবং স্বামীর অর্থ-সম্পদের আমানত রক্ষা করা স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মহান আল্লাহ বলেন, পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ

হিফাযাত করেছেনে। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।(সূরা আন নিসা:৩৪)

২.৩:স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার ও কর্তব্য

হাদিসে আছে, যখন স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমযান মাসের রোযা রাখে, গুপ্ত অঙ্গের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তখন সে তার পালনকর্তার জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমাদ।দ্র.সহীহুল জামে':৬৬১)

এ হাদিস থেকে স্বামীর আনুগত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

অপর এক হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,আমি জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ বাসিন্দাই মহিলা। মহিলারা আরজ করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর কারণ কী? তিনি বললেন, মহিলারা অভিসম্পাত বেশি করে এবং স্বামীদের না-শোকরি করে। [মুত্তাফাকুন আলাইহি](বুখারী :৬৪৪৯; মুসলিম :২৭৩৭)।

আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.)বলেন:আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে । কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে লাল পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে অথবা কালো পাহাড় থেকে লাল পাহাড়ে পাথর স্থানান্তরের নির্দেশ দিলে তা পালন করা তার জন্য অপরিহার্য হতো। হাসান বিশাওয়াহিদিহি (ইবনে মাজাহ :১৮৫২। আহমদ :২৩৯৫০)।

এরূপ বলার কারণ, স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক বেশি। রাসূলুল্লাহ (সা.)আরো বলেন স্ত্রী আল্লাহর পবিত্র সত্তার অধিকতর নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে তার কক্ষের অভ্যন্তরে থাকে। স্ত্রীর পক্ষে ঘরের আঙিনায় নামাজ পড়া মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর কক্ষের ভেতরকার কক্ষে নামাজ পড়া কক্ষের ভেতরে নামাজ পড়ার তুলনায় শ্রেয়।এটা বলার কারণ, স্ত্রীর অবস্থার উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা পর্দার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে অবস্থায় পর্দা বেশি হবে, সে অবস্থায়ই তার জন্য উত্তম।

আব্দুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহিলারা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু)। সে বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়। (তিরমিযি: ১১৭৩ ;ইবনে হিব্বান:৩২৯)।

মোটকথা স্বামীর হক স্ত্রীর ওপর অনেক। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি। একটি আত্মরক্ষা ও পর্দা এবং অপরটি প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্র দাবি না করা এবং স্বামীর উপার্জন হারাম হলে তা থেকে বেঁচে থাকা। পূর্ববর্তী কালে নারীর অভ্যাস তা-ই ছিল। তখন কোন পুরুষ সফরে গেলে তার স্ত্রী ও কন্যারা তাকে বলত, খবরদার! হারাম উপার্জন করবে না। আমরা ক্ষুধা ও কষ্টে সবর করব।;কিন্তু জাহান্নামের আগুনে সবর করতে পারবো না।

স্বামীর দায়িত্ব -কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তুষ্টচিত্তে তার মোহর পরিশোধ করে দেয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও।(আন নিসা: ৪)

নিজের সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরন -পোষণ করা স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ বলেন, পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।.... (সূরা আন নিসা, আয়াত ৩৪)

সকল অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা । মহান আল্লাহ বলেন, ''তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।'' (সূরা আন নিসা, আয়াত ১৯)

স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। যদি কারো একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।(সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৯)

২.৪:সন্তান প্রতিপালন

মনীষীগণ বলেন,তোমার সন্তান তোমার জন্য খুশবু স্বরূপ। তুমি তাদের ভালোবাসো, তারা তোমার খেদমত করবে। সহযোগী হবে। অন্যথায় তোমার অবাধ্য হতে পারে।

আনাস ইবনে মালিক(রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন, সপ্তম দিনের সন্তানের আকিকা করো, নাম রাখো এবং কষ্টদায়ক জিনিস তথা চুল ইত্যাদি তার থেকে দূর করে দাও। যখন ৬ বছর হয় তখন তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও। নয় বছরের হলে তার বিছানা পৃথক করে দাও। তেরো বছরের হলে নামাজ পরিত্যাগ করার কারণে প্রহার করো। ষোলো বছরের হলে তাকে বিবাহ করিয়ে দাও।অতঃপর তার হাত ধরে বল, ছেলে! আমি তোমাকে আদব শিখিয়েছি। তালিম দিয়েছি। বিবাহ করিয়েছি। দুনিয়াতে আমি তোমার ফেতনা হতে এবং আখিরাতে তোমার আযাব হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ ২৮৩৮)

রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেন, পিতার উপর সন্তানের হক আছে। পিতা সন্তানকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেবে এবং তার সুন্দর নাম রাখবে।রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন, প্রত্যেক সন্তান আকিকার কাছে বন্ধক রয়েছে।সপ্তম দিনে আকিকা ও পশু জবাই করা চাই এবং মাথা মুন্ডন করা চাই।

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তানের বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তার ওপর বদদোয়া করেছ? সে বলল, হ্যাঁ।তিনি বললেন, তাহলে তুমি নিজেই তাকে বরবাদ করে দিলে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের সন্তানদের ব্যাপারে কঠিন না হয়ে সহজ হওয়া এবং প্রজ্ঞা অবলম্বন করা অধিক জরুরী।
অর্থাৎ পিতা মাতার দায়িত্ব তথা সন্তানের হকগুলো হলো-

সন্তানের হক

১) নবজাতকের কানে আযান দেয়া।
২) আকীকা করা ও সুন্দর-অর্থপূর্ণ নাম রাখা।
৩) সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান।
৪) সন্তানদের দ্বীনী শিক্ষা দেয়া ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা।
৫) সন্তানদের ভালবাসা।
৬) সন্তানদের জন্য দোয়া করা ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে সন্তান প্রতিপালন রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং একটি বিষয়। চারপাশে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির সয়লাব,এসবের অনুসরণ যেন মুসলিমদের মধ্যে মহামারীর ন্যায় ছড়িয়ে পরছে।ফলে মুসলিম শিশুরা নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে না সঠিকভাবে পরিচিত হতে পারছে,আর না নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারছে।ফলে তারা লাইনচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা দিনদিন প্রকট হচ্ছে। আমাদের সন্তানদের আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন তাদের সুষ্ঠু তরবিয়ত ও দ্বীনের শিক্ষায় আলোকিত করে গড়ে তোলা। যেন তারা নিজেরা ইসলামকে ধারণ ও বহন করার পাশাপাশি তা অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দিতে পারে।
সন্তান আল্লাহর তায়ালার নিকট থেকে পাওয়া নিয়ামত, যা পিতা মাতার নিকট আমানতস্বরূপ।তাই তাদের সঠিকভাবে ইসলামি আদর্শ তথা সংস্কৃতিতে লালন পালন না করলে আল্লাহর নিকট পিতা মাতাকেও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। সন্তানের দুনিয়া, আখেরাত যেন সুন্দর হয়;সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে পিতা মাতাকে।

২.৫:পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার

পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন।তাঁরা আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন।তারা আমাদের ভালোবাসা, সম্মান,খেদমত পাবার সবচেয়ে বেশি হকদার। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার একটি উত্তম ইবাদত।
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন,যথা সময়ে নামাজ আদায় করা।ইবনে মাসউদ (রাযি)পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন,অতঃপর পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কোনটি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অতঃপর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর পথে জিহাদ)।[বুখারি:৫২৭,২৭৮২,৫৯৭০,৭৫৩৪;মুসলিম:৮৫,আহমাদ:৪২২৩]

রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন, সবচেয়ে বড় সৎকাজ হচ্ছে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শনের পর তিনি মারা গেলে তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্ক স্থায়ী রাখা ।

সন্তান জন্মদান,তাদের সঠিক তরবিয়তের সাথে লালন পালনের জন্য পিতা-মাতা তাদের জীবনব্যাপী অনেক ত্যাগ স্বীকার করে থাকেন।সারাজীবন তাদের খেদমত করলেও তাদের হক আদায় করা সম্ভব নয়।

আবু হুরায়রা (রাযি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:কোন সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তাকে দাসরূপে পায় এবং তাকে খরিদ করে আযাদ করে দেয় (তাহলে কিছু হক আদায় হয়)।[তিরমিজি ১৯০৬, আবু দাউদ ৫১৩৭, আহমাদ ৭১০৩, ৭৫১৬, ৮৬৭৬, ৯৪৫২,ইবনে মাজাহ:৩৬৫৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা মাতা জীবিত আছেন কী? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে তাঁদের খেদমতের চেষ্টা করো। [বুখারী:৩০০৪;মুসলিম:২৫৪৯;আহমাদ ৬৭৭৯]

ইমাম আহমাদ (রহ.) বর্ণনা করেন, যদি কেউ কোন মুসলমানকে কিনে মুক্ত করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করবেন। আর যদি বাবা-মাকে জীবিত পেয়েও তাদের খেদমত করে আল্লাহর কাছে থেকে ক্ষমা লাভে ব্যর্থ হলো,তার প্রতি ধিক্কার। আল্লাহর রহমত থেকে সে বহু দূরে। [মুসনাদে আহমাদ :৪/৩৪৪]

পিতা-মাতা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।আমরা যদি তাদের সাথে খারাপ আচরণ করি,তাদের যথোপযুক্ত সম্মান না করি,তাদের মনে কষ্ট দেই;তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি মা-বাবা সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে। অনুরূপ মা-বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।.... [আহমদ:৪৬২৪; তিরমিযি:১৯৬৮]

পিতা-মাতার সাথে কোনো অবস্থাতেই খারাপ ব্যবহার করা যাবে না, এমনকি যদি তারা মুশরিকও হয়ে থাকেন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাযি.)বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সঙ্গে আমার কাছে এলেন, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল। তখন আসমা (রাযি.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব? নবীজি বললেন, হ্যাঁ,তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। [বুখারী:৩১৮৩; মুসলিম:১০০৩]

পিতামাতার প্রতি কোনোরূপ বিরক্তিসূচক কথা বলতেও নিষেধ করেছে ইসলাম।তারা সন্তানদের অনেক আদর যত্নে বড় করে তোলেন,যথাসাধ্য সন্তানের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা

করেন।সন্তানের আবদারে কখনো বিরক্তবোধ করেন না,বরং তা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন,পূরণে ব্যর্থ হলে দুঃখ বোধ করেন। অথচ পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান,তখন তাদের আচরণে কখনো কখনো সন্তান বিরক্ত হয়ে যায়;এমনকি তাদের তিরস্কার করতেও পিছপা হয় না।বেমালুম ভুলে যায় পিতা-মাতার হক,ভুলে যায় তাদের সকল অবদান। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ বৃদ্ধ পিতা-মাতার আশ্রয় হয় বৃদ্ধাশ্রম;যারা কিনা শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সন্তানকে নিজের কাছে আগলে রেখেছে সারাজীবন। তারাই বৃদ্ধ বয়সে হয়ে উঠে সন্তানের নিকট বোঝাস্বরূপ।

“তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচার-পূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্র-ভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে রব তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন”। [সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪]

আল্লাহর নাফরমানি তথা অবাধ্যতার উপদেশ যদি কোনো পিতা-মাতা দেন তবে তা পালনীয় নয়।তবে এছাড়া তাদের সকল আদেশ পালন করা,তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের একান্ত আবশ্যকীয় কর্তব্য।

২.৬:উত্তরাধিকার

কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার ঋণ শোধ,ওসিয়ত পূরণ ও কাফন দাফনের খরচ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদ গুলো কুরআন-হাদিসের নির্ধারিত পন্থায় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া ফরজ। তবে বর্তমান সমাজে এই বিধানটি প্রায় মৃত বলা যায়। সমাজের অধিকাংশ মানুষই এই বিধান সম্পর্কে সঠিকভাবে জানে না।অনেকেই এই বিধানটিকে হালকা ভাবে নেন তথা মানেন না। কিন্তু উত্তরাধিকার সম্পদ বা মিরাস সঠিকভাবে বন্টন না করায় আল্লাহর কাছে তারা কঠিন ভাবে পাকড়াও হবেন।

কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে রয়েছে -

পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে।(আন নিসা :৭)

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য

হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।(আন নিসা :১১)

আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।(আন নিসা :১২)

তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব।(আল-বাকারাহ :১৮০)

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ চারটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন -

১) মৃত ব্যক্তির কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা।
২) যদি সে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তার সকল সম্পদ দিয়ে হলেও তার ঋণ পরিশোধ করা।
৩) তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা ওসিয়ত পূরণ করা.।
৪) এই তিনটি কাজ সম্পাদনের পর উত্তরাধিকারের যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

মিরাসের মধ্যে শুধু টাকা পয়সা ও জমি-জমাযই অন্তর্ভুক্ত নয় ;বরং যা কিছু মত ব্যক্তি রেখে গেছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত।সাধারণ কোন জিনিসও মিরাস সংশ্লিষ্ট হক ও বন্টন থেকে পৃথক রাখা জায়েজ নয়। যেমন-

১) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র (কাপড়, জুতা, বাসন, ঘড়ি, সাইকেল, মোটরসাইকেল, গাড়ি, ফার্নিচার, কিতাবাদি সহ অন্য সকল জিনিসপত্র)।

২) ঘরের আসবাবপত্র।

৩) যে সকল জিনিস মৃত ব্যক্তি দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন।

৪) মৃত ব্যক্তির উপার্জনের সকল সরঞ্জাম।

৫) স্ত্রীর মোহর (মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে তার প্রাপ্য মোহর তার মিরাসের অংশ হবে। সেটা অনাদায়ই হোক কিংবা এমন আদায়কৃত যেটা আরেকজনের কব্জায় রয়েছে)।

৬) জমিজমা ও ঘরবাড়ি।

৭) জমানো টাকা পয়সা।

৮) মৃত ব্যক্তির পাওনা সমূহ (মানুষের কাছে মৃত ব্যক্তির যত পাওনা আছে সব মিরাসের অংশ। যখন যেটুকু উসূল হবে সেটা ওয়ারিশদের মধ্যে হিস্যা অনুযায়ী বন্টন হতে থাকবে)।

৯) ধার বা ভাড়া দেওয়া জিনিসপত্র।

১০) কপিরাইট।

১১) তার মৃত আত্মীয়দের থেকে পাওয়া মিরাসের অংশ।

১২) সরকার বা কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা ফান্ড।

তবে যে অর্থ নিয়ম অনুযায়ী চাকরিজীবীর কোন আত্মীয়কে নির্দিষ্ট করে প্রদান করা হয়, সেটা ওই আত্মীয়র ব্যক্তিগত মালিকানা। সেটা মিরাজের অংশ হবে না। যেমন মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য জারিকৃত পেনশন, সন্তানদের শিক্ষাগতা, ঘর বা চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টন এর ক্ষেত্রে -
ইসলামী শরীয়তে মৃত ব্যক্তির সকল ওয়ারিশদের-কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন -

১) নির্ধারিত অংশের হকদার।

২) অবশিষ্টভোগী।

৩) মৃতের অন্যান্য নিকটাত্মীয়।

নির্ধারিত অংশের হকদার বা আসহাবুল ফুরুয:

মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন, ঋণ পরিশোধ এবং ওসিয়ত পূরণের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে তা সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে নির্দিষ্ট অংশ অনুযায়ী। এরপর যদি কোন সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা পরবর্তী দুই শ্রেণীতে পর্যায়ক্রমে বন্টন করা হবে।

নির্ধারিত অংশের হকদারদের মধ্যে রয়েছে -

১) পিতা।

২) স্বামী।

৩) দাদা এবং তার ঊর্ধ্বতন পুরুষ।

৪) বৈপিত্রেয় ভাই।

৫) মা।

৬) স্ত্রী।

৭) আপন কন্যা।

৮) পুত্রের কন্যা ও অধস্তন সকল মেয়ে।

৯) আপন বোন।

১০) বৈমাত্রেয় বোন।

১১) বৈপিত্রেয় বোন।

১২) দাদী ও নানী এবং তাদের ঊর্ধ্বতন সকলে।

স্বামী:

স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর দুই অবস্থা হতে পারে -

১) যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে তার কোন ঔরসজাত সন্তান না থাকে তাহলে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবেন।

২) আর যদি ঔরসজাত কোন সন্তান থাকে তাহলে এক চতুর্থাংশ পাবেন।

পিতা:

সন্তান মারা গেলে পিতার তিন অবস্থা হতে পারে -

১) যদি মৃত সন্তানের কোন পুত্র থাকে তাহলে পিতা সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবেন।

২) যদি মৃত সন্তানের কোন পুত্র না থাকে কিন্তু তার কোন কন্যা থাকে তাহলে পিতা এক ষষ্ঠাংশ পাবেন।

৩) যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তানে না থাকে তাহলে পিতা শুধুমাত্র আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সকল অংশ পাবেন।

দাদা:

যদি পিতা জীবিত না থাকে তাহলে পিতার অংশ পিতার পিতা বা তার পিতা পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকে তাহলে দাদা বঞ্চিত হবে। তবে মৃত ব্যক্তির পিতা যদি জীবিত না থাকে তাহলেই শুধুমাত্র দাদা মিরাসের সম্পত্তি পাবে। আর দাদার মিরাসের সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতার ন্যায় অর্থাৎ পিতা যে পরিমাণ সম্পত্তি পেত দাদা সে অংশ পাবে।

বৈপিত্রেয় ভাই :

(মৃত ব্যক্তির মায়ের গর্ভজাত ভাই কিন্তু পিতা ভিন্ন)

১) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনি বা অধস্তন কেউ কিংবা পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ বা উর্ধ্বতন কোন পুরুষ না থাকে এবং শুধুমাত্র একজন বৈপিত্রেয় ভাই থাকে তাহলে সে সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

২) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই থাকে তাহলে সবাই মিলে সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে।

৩) আর যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনি বা অধস্তন কেউ কিংবা পিতা,পিতামহ প্রপিতামহ বা উর্ধ্বতন কেউ জীবিত থাকে তাহলে বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা বঞ্চিত হবে।

মাতা:

সন্তান মারা গেলে মায়ের তিন অবস্থা হতে পারে -

১)যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে কিংবা একাধিক ভাই বোন থাকে তাহলে মা সমুদয় সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবেন।

২)যদি মৃত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা-মাতা উভয়ে থাকে তাহলে সম্পত্তি থেকে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর মা বাকি সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবেন।

৩)যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে বা ভাই-বোন দুইজনের কম থাকে এবং স্ত্রী কিংবা স্বামী জীবিত না থাকে তাহলে মা সমুদয় সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাবেন।

স্ত্রী:

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর দুই ধরনের অবস্থা হতে পারে -

১)যদি মৃত স্বামীর কোন সন্তান না থাকে তাহলে এক চতুর্থাংশ পাবেন।

২)আর যদি কোন সন্তান থাকে তাহলে এক অষ্টমাংশ পাবেন।

এক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী জীবিত থাকলেও সবাই এক স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ পাবেন এবং এক স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ সবাই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন।

কন্যা:

বাবার মৃত্যুর পর কন্যার তিন অবস্থা হতে পারে -

১) যদি শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২) আর যদি কন্যা একাধিক থাকে এবং কোন পুত্র না থাকে তাহলে সবাই দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং কন্যা একসাথে থাকে তাহলে পুত্র কন্যা ২:১ অনুপাতে পাবে।

পৌত্রীগণ:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আপন পুত্রের কন্যা, পৌত্রের কন্যা প্রপৌত্রের কন্যা এভাবে অধস্তন সকল পুত্রের কন্যা । তারা একে অপরের অবর্তমানে দাদার সম্পত্তি থেকে মিরাস লাভ করবে।এদের মিরাস পাওয়ার জন্য শর্ত হলো মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র কিংবা একাধিক কন্যা জীবিত না থাকা।

পুত্রের কন্যাদের ছয়টি অবস্থা হতে পারে -

১) যদি মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র-কন্যা না থাকে এবং শুধুমাত্র একজন পৌত্রীই থাকে তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২) আর যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক পৌত্রী থাকে তাহলে সবাই মিলে সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩) যদি উল্লিখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন পৌত্র থাকে এবং সাথে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তাহলে পৌত্রীগণ আসাবা হয়ে যাবে এবং নির্ধারিত অংশের হকদারদের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পৌত্র এবং পৌত্রীগণ ২:১ অনুপাতে পাবে।

৪) যদি মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র না থাকে কিন্তু একজন মাত্র কন্যা থাকে এবং সাথে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে তাহলে সবাই মিলে সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

৫) যদি উল্লিখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক কন্যা থাকে তাহলে পৌত্রিগণ বঞ্চিত হবে।

৬) যদি মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র থাকে তাহলেও পৌত্রীগণ বঞ্চিত হবে।

আপন বোন :

১) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পিতা, ভাই কেউ জীবিত না থাকে এবং

আপন বোন শুধুমাত্র একজন থাকে তাহলে বোন সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পিতা, ভাই কেউ জীবিত না থাকে এবং আপন বোন একের অধিক থাকে তাহলে তারা সবাই মিলে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা, এবং পিতা জীবিত না থাকে এবং আপন বোনের সাথে আপন ভাই জীবিত থাকে তাহলে বোনেরা ভাইয়ের কারণে আসাবা হয়ে যাবে । আসাবা হিসেবে ভাই বোন ২:১ অনুপাতে পাবে।

৪) যদি মৃত ব্যক্তির আপন ভাই না থাকে কিন্তু একজন মাত্র কন্যা থাকে তাহলে আপন বোনেরা এক ষষ্ঠাংশ পাবেন। আর একাধিক কন্যা থাকলে এবং অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকলে আপন কন্যাকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে বোনেরা তা আসাবা হিসেবে পাবে।

৫) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র কিংবা পিতা কেউ জীবিত থাকে তাহলে আপন বোনেরা বঞ্চিত হবে।

বৈপিত্রেয় বোন :

(মৃত ব্যক্তির একই মায়ের সন্তান কিন্তু বাবা ভিন্ন)

১) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা কিংবা অধস্থন কেউ অথবা পিতা, দাদা ঊর্ধ্বতন কেউ না থাকে আর বৈপিত্রেয় বোন শুধুমাত্র একজন থাকে তাহলে সম্পত্তির ১ ষষ্ঠাংশ পাবে।

২) উল্লেখিত অবস্থায় যদি বৈপিত্রেয় বোন একাধিক থাকে তাহলে সবাই মিলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পাবে ।

৩) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা অধস্তন কেউ বা পিতা, দাদা বা উর্ধ্বতন কেউ জীবিত থাকে তাহলে তারা বঞ্চিত হবে।

বৈমাত্রেয় বোন:

(যাদের বাবা এক কিন্তু মা ভিন্ন)

১) যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, পুত্রের পুত্র বা অধস্তন কেউ, পিতা, দাদা বা ঊর্ধ্বতন কেউ, আপন ভাই, একাধিক আপন বোন কিংবা একজন আপন বোন, সাথে কন্যা, কন্যার কন্যা বা অধস্তন কেউ যদি জীবিত না থাকে আর বৈমাত্রেয় বোন শুধুমাত্র একজন থাকে তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

২) যদি উল্লেখিত অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন একাধিক থাকে তাহলে তারা সবাই

মিলে সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

৩) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র আপন বোন থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় বোন এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

৪) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক আপন বোন থাকে তাহলে তারা বঞ্চিত হবে।

৫) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির একাধিক আপন বোন থাকে এবং বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাইও থাকে তাহলে ভাইয়ের কারণে বোনেরা আসাবা হয়ে যাবে। তখন বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ২:১ অনুপাতে পাবে।

৬) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন কন্যা, কন্যার কন্যা বা অধস্তন কেউ থাকে এবং আপন বোন না থাকে তাহলে তারা আসাবা হয়ে যাবে। তখন নির্দিষ্ট হকদারদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার পুরোটাই তারা আসাবা হিসেবে পাবে।

৭) যদি উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন পুরুষ ওয়ারিশ জীবিত থাকে তাহলে তারা বঞ্চিত হবে ।

দাদি বা নানি :

১) যদি মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, দাদা বা ঊর্ধ্বতন কেউ জীবিত না থাকে তাহলে দাদী এবং নানী উভেয় সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

২) যদি মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকে তাহলে দাদী এবং নানী উভয়ে বঞ্চিত হবে।

৩) যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকে তাহলে দাদি বঞ্চিত হবে কিন্তু নানি এক ষষ্ঠাংশ পাবে।

অবশিষ্টভোগী বা আসাবা:

এরা হলেন মৃত ব্যক্তির এমন আত্মীয়-স্বজন যাদের কোন অংশ শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে আসাবুল ফুরুয তাদের নির্দিষ্ট অংশ পাওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে কিংবা আসাবুল ফুরুযের অবর্তমানে তাদের সমুদয় সম্পত্তির যারা মালিক হয় তারা হলেন আসাবা বা অবশিষ্টভোগী।

আসাবাদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের পদ্ধতি হলো -প্রথমে নিকটাত্মীয়রা পাবে, এরপর অবশিষ্ট থাকলে দূরের আত্মীয়রা পাবে।

মৃতের অন্যান্য নিকটাত্মীয় বা উলূল আরহাম:

মৃত ব্যক্তির যে সকল আত্মীয়-স্বজন আসাবুল ফুরুয বা আসাবা হিসেবে মিরাস পায় না বরং এই দুই শ্রেণীর কেউ যদি জীবিত না থাকে তখন যারা মিরাসের সম্পত্তি পায় তারা হলেন উলূল আরহাম।

২.৭:তালাক

তালাক শব্দের অর্থ বিচ্ছেদ বা ত্যাগ করা, বন্ধন মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া।ইসলাম ধর্মে শরয়ী বিবাহ বিচ্ছেদকে তালাক বলা হয়।এক্ষেত্রে স্বামী সর্বাবস্থায় তালাক দিতে পারেন। স্ত্রী শুধুমাত্র তখনই নিজেকে তালাক দিতে পারবেন যখন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়।

শরয়ী আইনে জায়েয বা বৈধ কাজের মধ্যে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক। হাদিসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, "মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় হালাল হচ্ছে তালাক।" (আবু দাউদ শরীফ)

জীবনে চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে রক্ষার জন্য ইসলামের তালাকের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন চরমভাবে বিরোধ দেখা দেয়, পরস্পর মিলে মিশে শান্তিপূর্ণ ও মাধুর্মযয় দাম্পত্য জীবন যাপন যখন একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, পারস্পরিক সম্পর্ক যখন হয়ে পড়ে তিক্ত-বিষাক্ত কিংবা একজনের মন যখন অপরজন থেকে এমন ভাবে বিমূখ হয়ে যায় যে তাদের শুভ মিলনের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না ঠিক তখনই এই চূড়ান্ত পন্থা তথা তালাক অবলম্বনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইসলামে।

তালাকের প্রকারভেদ

তালাকের প্রকারভেদ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য। যেমন -

১) হুকুমের দিক থেকে
২) সিফাতের দিক থেকে
৩) শব্দ গত দিক থেকে

হুকুমের দিক থেকে তালাক আবার তিন প্রকার। যথা-

১) তালাকে রাজঈ
২) তালাকে বায়িন
৩) তালাকে মুগাল্লাযা

সিফাতের দিক থেকে তালাক আবার তিন প্রকার। যথা-

১) আহসান তালাক

২) হাসান তালাক

৩) বিদআত তালাক

শব্দগত দিক থেকে তালাক আবার দুই প্রকার। যথা -

১) তালাকে সরীহ

২) তালাকে কিনায়া

তালাকে রাজঈ:

এটি এমন তালাক যা প্রদান করলে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার থেকে যায়। স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে সাথে সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত পুনরায় নিজের বন্ধনে ফিরিয়ে আনতে পারে অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীর সাথে নিরিবিলি অবস্থান করা কিংবা নিরবিলি অবস্থানের দিকে আকর্ষণকারী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া অথবা খাহেশাতের সাথে স্পর্শ করা কিংবা আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম বললেও রাজায়াত হয়ে যায়।

তালাক শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে সুস্পষ্ট তালাক এভাবে বলা যে, "তুমি তালাক" কিংবা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম"- এই সকল শব্দ দ্বারা তালাক দিলে তালাকে রাজঈ পতিত হয়।

তালাকে বায়িন

এটি এমন তালাক যা প্রদান করলে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার থাকে না। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে(হিলা ব্যতীত) নতুনভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

তালাকের সাথে যদি কোন প্রকার অতিরিক্ততা বা কঠোরতার গুণ (তোমাকে তালাকে বায়িন বা তোমাকে অকাট্য তালাক) যুক্ত করা হয় তাহলে তালাকে বায়িন হয়। তবে তিন তালাকের নিয়ত করলে তিন তালাকই পতিত হবে। অন্যথায় এক তালাকে বায়িন হবে।

তালাকে মুগাল্লাযা

এটি এমন তালাক যার কারণে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ স্ত্রী অপর কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অতঃপর ওই স্বামী তার সাথে নিরিবিলি অবস্থান করার পর তালাক দিলে অথবা স্বামী মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় উক্ত স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

আহসান তালাক

এটি এমন তালাক কে বোঝায় যেখানে নিজের স্ত্রীকে এমন তহূরে এক রাজঈ তালাক দেওয়া যে তহূরে তার সাথে মিলন হয়নি। তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে এই অবস্থায় রেখে দেওয়াকে আহসান তালাক বলে। ইদ্দত অতিবাহিত হলে সে আপনা আপনি বায়িন হয়ে যাবে।

হাসান তালাক

স্ত্রীকে এমন তহূরে তালাক দেওয়া যে তহূরে তার সাথে মিলন হয়নি। প্রথম তহূরে তাকে এক তালাক দিবে। তারপর দ্বিতীয় তহূরে দ্বিতীয় তালাক দিবে। আর তৃতীয় তহূরে তৃতীয় তালাক দিবে।[মুহীতে ছুরুখসী, আলমগীরী]

বিদআত তালাক

একই তহূরে তিন তালাক অথবা একসাথে তিন তালাক কিংবা যে তহূরে মিলন হয়েছে সেই তহূরে এক তালাক দেওয়া অথবা হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়াকে বিদআত তালাক বলে। এরূপ তালাক কার্যকর হবে। তবে তালাকদাতা কঠিন গুনাগার হবে।

তালাকে সরীহ:

পরিষ্কার অর্থ প্রকাশক এবং এক অর্থবোধক, যাকে তালাকে সরীহ বলা হয়।

যেমন -কেউ তার স্ত্রীকে বলল, "আমি তোমাকে তালাক দিলাম" কিংবা "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম। "

তালাকে কিনায়া:

এর অর্থ পরিষ্কার নয়। একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে।

এক্ষেত্রে তালাকের অর্থও হতে পারে। আবার অন্য অর্থও হতে পারে।

যেমন -কেউ তার স্ত্রীকে বলল, "আমি তাকে দূর করে দিলাম।"এই কথার অর্থ তালাক হতে পারে, আবার এই অর্থ হতে পারে যে, তালাক দেইনি বরং বর্তমানে আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আসতে নিষেধ করেছি।

এরূপ শব্দকে কিনায়া বলে। কিনায়ার আরো অনেক শব্দ আছে।

তালাকের হুকুম :

যদি রাজঈ তালাক হয় তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যদি তালাকে বায়িন হয়, তখন ইদ্দত শেষ হওয়া ব্যতীতই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। [ফাতহুল কাদীর, আলমগীরী]

আর যদি তিন তালাক পূর্ণ হয়ে যায় তখন এই স্ত্রীকে হিলা (অন্য কারো সাথে বিবাহ দেয়ার পর তার থেকে বিচ্ছিন্ন) না হওয়া পর্যন্ত কখনো সে বিবাহ করতে পারবে না । [আল বাহরুল মুহীত লিচ্ছুরুখসী,আলমগীরী]

উল্লেখ্য যে, তিন তালা রাজঈ হয় না। এমনকি "তালাকে রাজঈ" নাম উচ্চারণ করা সত্ত্বেও তিন তালাক হয়ে গেলে আর স্বামীর কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকে না। তা তালাকে মুগাল্লাযা হয়ে যায়। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে তিন তালাক দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ তালাকে এতই নিকৃষ্ট কাজ যে, যদি কেউ এক তালাক দিয়ে পুনরায় ফিরিয়ে নেয় কিংবা বিবাহ দোহরিয়ে ২/৩ বছর পর পুনরায় এক তালাক দেয় এবং তারপর ২/৩ বছর পর আবার এক তালাক দেয় তাহলে সব মিলে যোগ হয়ে তালাকে মুগাল্লাযায় পরিণত হয়ে সম্পূর্ণভাবে তালাক হয়ে যায়। একজন পুরুষ একজন স্ত্রীর উপর তিন তালাক দেয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে, এক তালাক দেয়ার পর যতদিন ইদ্দত শেষ না হয়, ততদিন আরো দুই তালাক দেয়ার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়, তৃতীয় তালাক দিতে পারে। কাজেই ইদ্দতের মধ্যে যদি এক তালাক বা দুই তালাক দেয় তবে তাও তালাক হবে।

"তালাক দিব" বললে তালাক হবে না। অতীত বা বর্তমান কালের শব্দ ব্যবহার করলে তালাক হবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কালের শব্দ ব্যবহার করলে তালাক হবে না। অর্থাৎ, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, যদি তুমি এই কাজ করো তবে তোমাকে তালাক দিব, এরূপ বললে, সেই কাজ করুক বা না করুক তালাক পতিত হবে না। কিন্তু যদি এরূপ বলে যে, যদি তুমি এই কাজ করো তবে তোমাকে তালাক দিলাম, তাহলে যখন এই কাজ করবে, তখনই তালাক সংঘটিত হবে। যদি কেউ তালাক দেয়ার সাথে সাথেই ইনশাআল্লাহ বলে দেয় কিংবা এরকম বলে যে, মহান আল্লাহ পাক চাহে তো তালাক, তাহলে তালাক কার্যকর হবে না। অবশ্য তালাক দেয়ার পর কিছুক্ষণ দেরি করে যদি ইনশাআল্লাহ বলে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে।

অধ্যায় ৩:সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিৎপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি Culture-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি **১৯২২** সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়।[1]সংস্কৃতি শব্দটা এসেছে মারাঠি ভাষা থেকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় কালচার অর্থে সংস্কৃতি শব্দটা প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ এর অনুমোদন দেন। এর আগে বাংলায় কৃষ্টি শব্দটি চালু ছিল কালচার অর্থে। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্টি শব্দটা মনে করতেন, কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত, সুতরাং কালচার অর্থে সংস্কৃতিই উপযুক্ত।

প্রাচীন রোমের বাগ্মী সিসেরো তার তুসকালেনে ডিসপুটেশনস (Tusculanae Disputationes) নামক গ্রন্থে প্রথম আধুনিক "সংস্কৃতি" ("culture") শব্দটি ব্যবহার করেন,আত্মার চর্চা'র কথা লিখেন, সেখানে তিনি একটি দার্শনিক আত্মার উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক রূপক ব্যবহার করেন, যেখানে পরমকারণবাদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে আত্মার চর্চা মানুষের উন্নয়নের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য আদর্শ। স্যামুয়েল পুফেনডর্ফ এই রূপকটিকে একই ধরনের অর্থ করে আধুনিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছেন কিন্তু কখনোই এটি মানুষের সম্পূর্ণতার দর্শন বলে ধারণা করেন নি। তার ব্যবহার, এবং তার পরে বহু লেখক "মানুষ কীভাবে উৎসগত বর্বরতা কাটিয়ে ওঠে , আর কীভাবে দক্ষতার মাধ্যমে পুরোপুরি মানুষ হয়ে ওঠে তা নির্দেশ করেন"।[2]

সংগা

সংস্কৃতি (বা কৃষ্টি) হলো সেই জটিল সামগ্রিকতা যাতে অন্তর্গত আছে জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রাজনীতি, আচার এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের দ্বারা অর্জিত অন্য যেকোনো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা অভ্যাস।[3]

নৃবিজ্ঞানী টেইলরের ভাষ্যমতে,

সমাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত নানা আচরণ, যোগ্যতা এবং জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, আদর্শ, আইন, প্রথা ইত্যাদির এক যৌগিক সমন্বয় হল সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি মানুষকে পরিচিত করে তোলে তার শিকড়ের সঙ্গে এবং সমাজে স্থাপন করে এক অনন্য পরিচয়।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

গতিশীল: এটি পরিবর্তনশীল, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরের সময় এবং অন্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এর রূপ বদলাতে পারে।

সমন্বিত: সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান একটি সুসংহত কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

১. সংস্কৃতি অর্জিত

সংস্কৃতি জন্মগত নয়; মানুষ তা পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করে। যেমন—ভাষা, আচরণ, পোশাকের ধরণ ইত্যাদি শেখার মাধ্যমে মানুষ সমাজের অংশ হয়।

২. সংস্কৃতি সামাজিক

সংস্কৃতি একক কোনো বিষয় নয়, বরং সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিশ্বাস, আচরণ, জ্ঞান ইত্যাদির সামগ্রিক রূপ তথা সমাজের যৌথ সম্পদ। একে অপরের সংস্পর্শ, পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সামাজিক জীবনযাপনের মাধ্যমে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সমাজ ছাড়া সংস্কৃতি অস্তিত্বহীন।

৩. সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল ও অভিযোজিত

সংস্কৃতি কখনো স্থির নয়; এটি সময়, পরিবেশ ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজিত হয়। যেমন—একসময় যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চিঠি, এখন সেটি মোবাইল ও ইন্টারনেটে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তনই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।

রেইমন পানিক্কার ২৯টি উপায়ে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয়েছিল বলে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন, বিবর্তন, উদ্ঘাটন, নবরূপদান, নতুন ভাবনা, সংস্কার, নতুন ভাব, প্রথা, রীতি উদ্ভাবন, পুনর্জাগরণ, বিপ্লব, পরিব্যক্তি, উন্নতি, বিকিরণ, আত্মীকরণ, ধার করা, মানসিক ঔদার্য, সমন্বয় প্রচেষ্টা, আধুনিকীকরণ, দেশিয়করণ, এবং রূপান্তকরণ রয়েছে।

৪. সংস্কৃতি প্রজন্মান্তরে স্থানান্তরিত

সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। পূর্বপুরুষের বিশ্বাস, রীতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সন্তানরা শেখে ও ধারণ করে। এই ধারাবাহিকতাই সংস্কৃতিকে জীবন্ত রাখে।

৫. সংস্কৃতি সর্বব্যাপী

সংস্কৃতি মানুষের জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে মিশে আছে—খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ভাষা, আচরণ, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা, রাজনীতি—সবকিছুতেই এর প্রতিফলন ঘটে। সংস্কৃতি মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

৬. সংস্কৃতি প্রতীকনির্ভর

সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন—জাতীয় পতাকা দেশের মর্যাদা প্রকাশ করে, ভাষা একটি জাতির আত্মপরিচয় বহন করে, আবার ধর্মীয় প্রতীক মানুষের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়।

৭. সংস্কৃতি সমন্বিত ও সংহত

সংস্কৃতির সব উপাদান পরস্পর সম্পর্কিত। ধর্ম, নৈতিকতা, অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকে। একটির পরিবর্তন অপরটির উপর প্রভাব ফেলে, ফলে সংস্কৃতি এক সুন্দর সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি করে।

অধ্যায় ৪:ইসলামি সংস্কৃতি

সংস্কৃতি শব্দটির সাধারণত সাকাফাহ,তাহযিব,তামাদ্দুন বা কালচারের প্রতিশব্দ। আরবিতে একে বলা হয় সাকাফাহ্।

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের উপযুক্ত, সুন্দর, মার্জিত ও পরিশীলিত আচার-আচরণ, আহার, চলাফেরা, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, শিল্প ও সাহিত্য, ভাষা, ধর্মীয় রীতিনীতি, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা এবং মানুষের দিনরাত্রির হাজারো কাজকর্ম এই সব কিছুরই সমষ্টি।

ইসলামি সংস্কৃতির পরিচয়

ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধ, আকিদা-বিশ্বাস ও আচরণিক কার্যাদি সবই ইসলামী শরীয়তের অনুকূলে থাকে।

সহজভাবে বলা যায়, জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলী, বিধি-বিধান পালনীয় এর সবকিছুই ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ। ইসলামী জীবনবোধের বিপরীতে কোন আচার-আচরণ ও কৃষ্টি কোন মুসলমান গ্রহণ করলে তা ইসলামী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ কুসংস্কার, বিদআত ও ক্ষেত্রবিশেষে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত হয়। ইসলামী সংস্কৃতিতে বিজাতীয় অনুকরণ নিষিদ্ধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি অপর জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। " (মুসনাদে আহমদ)

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ইসলাম যেমন কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তেমনি ইসলামী সংস্কৃতি ও কালজয়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

১) ইসলামী সংস্কৃতির উৎস হল আল কুরআন ও সুন্নাহ। সকল মানুষের জন্য এই সংস্কৃতি অপরিহার্য। আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য যে জীবন পদ্ধতি দান করেছেন তাই এই সংস্কৃতির মূল উৎস। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।" (সূরা আলে ইমরান:১৯)

২) ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বজনীন। এটা কোন দেশ কাল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলমান যে কোন দেশের, যেকোনো সমাজের বা যে কোনো কালের হোক না কেন ইসলামিক সংস্কৃতি তাকে সুন্দর ও শালীন জীবন দান করে।

৩) এতে মানুষে মানুষে কোন প্রভেদ করা হয় না। উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, আরব-অনারবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলেই আদম সন্তান।

৪) ইসলামী সংস্কৃতি সাম্যের ধারক ও বাহক। সকল মানুষ ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ, আভিজাত্যবাদের কোন স্থান ইসলামে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে, তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। " (সূরা আল হুজুরাত:১৩)

৫) ইসলামী সংস্কৃতি ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত। একজন মুসলমান যা বিশ্বাস করে তা আমলে পরিণত করা তার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। ইসলামে ঈমান ব্যতীত আমলের কোন মূল্য নেই, তেমনি আমল ব্যতীত ঈমানের কোন মূল্য নেই। একজন মানুষকে তখনই ইসলামী সংস্কৃতিবান বলা হবে, যখন ঈমান ও আমলের সমন্বয়ে তার জীবন পরিচালিত হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। " (সূরা কাহাফ :১০৭)

৬) ইসলামী সংস্কৃতিতে ইহকালীন জীবন ও পরকালীন জীবন একটি সূত্রে গাথা। তাই ধর্ম ও সমাজ বা রাষ্ট্রকে আলাদা করে দেখানো যায় না।

৭) ইসলামী সংস্কৃতিতে বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, ধোঁকাবাজি করা, অশ্লীলতার কোন স্থান নেই। মার্জিত রুচিশীল ও পরিশীলিত জীবনাচার হল ইসলামী সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব

একজন মানুষকে ইসলামিক সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান হতে হলে প্রথমে তাকে মুসলমান হতে হবে অর্থাৎ ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসারী হতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি ঈমানের রক্ষাকবচ। মুসলিম জাতির পরিচিতি কেবল ইসলামিক সংস্কৃতির মাধ্যমেই তুলে ধরা সম্ভব। সমাজে যদি ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা না থাকে তাহলে বিজাতীয় সংস্কৃতি সেখানে বাসা বাঁধে। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে জাতীয় সত্তা, পরিচিতি বা জাতীয় ঐক্য রক্ষার জন্য ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা আবশ্যক।

অধ্যায় ৫:পশ্চিমা সংস্কৃতি

পশ্চিমা বিশ্ব-এর সংজ্ঞা প্রেক্ষাপট এবং দৃষ্টিকোণ অনুসারে পরিবর্তিত হয়; পশ্চিম হল একটি বিকশিত ধারণা যা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্বারা গঠিত, এবং নির্দিষ্ট সীমানা এবং সদস্যদের সাথে একটি অনমনীয় অঞ্চল নয়।
আমেরিকার ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের পর , মূলত পশ্চিমা ইউরোপীয় শক্তিগুলিকে জড়িত করে, ল্যাটিন খ্রিস্টধর্মের উত্তরাধিকারী হিসাবে "পশ্চিমা" বিশ্বের একটি ধারণা উদ্ভূত হয়েছিল। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুসারে , "পশ্চিমা বিশ্ব" শব্দটির প্রথম উল্লেখ 1586 সালে পাওয়া যায়, যা উইলিয়াম ওয়ার্নারের লেখায় পাওয়া যায় ।
পশ্চিমা বিশ্বের উপাদান হিসেবে বিবেচিত দেশগুলি ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তে দৃষ্টিকোণ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মতো দেশগুলিকে পশ্চিমা বিশ্বের আধুনিক সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ এই অঞ্চলগুলি এবং তাদের মতো অন্যান্য অঞ্চলগুলি ব্রিটিশদের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে । ঐতিহাসিক সময়ের উপর নির্ভর করে, রাশিয়াকে কখনও কখনও পশ্চিমের একটি অংশ হিসাবে দেখা হত, এবং কখনও কখনও এর সাথে যুক্ত করা হত। টেলিগ্রাফ এবং রেলপথের মতো যোগাযোগ-পরিবহন প্রযুক্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরের মধ্যে দূরত্ব "সঙ্কুচিত" করে দেওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মহান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমের ধারণায় আরও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে ।
১৮ শতক থেকে ২০ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, পশ্চিমের বিশিষ্ট দেশগুলি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডকে কেউ কেউ শ্বেতাঙ্গদের জন্য জাতিগত রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করেছেন । বর্ণবাদকে পশ্চিম ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি অবদানকারী কারণ হিসেবে দাবি করা হয় , যা আজ ভৌগোলিক পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ অংশ গঠন করে এবং এটি গ্লোবাল নর্থ এবং গ্লোবাল সাউথের মধ্যে বিভক্ত । ১৯৬০-এর দশকের শেষের দিক থেকে, পশ্চিমা বিশ্বের কিছু অংশ অভিবাসন এবং উর্বরতার হারের পরিবর্তনের কারণে তাদের বৈচিত্র্যের জন্য উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে । সময়ের সাথে সাথে "পশ্চিম" ধারণাটি একটি দিকনির্দেশনামূলক ধারণা থেকে একটি সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণায় বিকশিত হয়েছে - অগ্রগতি এবং আধুনিকতার ধারণা দিয়ে প্রদত্ত ভবিষ্যতের ধারণা হিসাবে সাময়িকীকরণ করা হয়েছে।

অর্থাৎ,পশ্চিমা বিশ্ব (Western world বা the West) বলতে সাধারণভাবে পৃথিবীর সেই অঞ্চলগুলোকে বোঝানো হয়, যেগুলোর সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ও চিন্তাধারা ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে।এটি একটি ভৌগোলিক ধারণা নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারণা — অর্থাৎ, এটি মানসিকতা, জীবনধারা ও সামাজিক ব্যবস্থার একটি প্রতীক।

"পশ্চিমা বিশ্ব" শব্দটি মূলত ব্যবহৃত হতো ইউরোপীয় সভ্যতা ও খ্রিষ্টান বিশ্বকে বোঝাতে, বিশেষ করে মধ্যযুগে "পূর্ব (Orient)" ও "পশ্চিম (Occident)" বিভাজনের সময়।
বর্তমানে "পশ্চিমা বিশ্ব" বলতে সাধারণত নিচের দেশ ও অঞ্চলের সমষ্টিকে বোঝায়—
পশ্চিম ইউরোপ — যেমন: যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন ইত্যাদি।
উত্তর আমেরিকা — যেমন: যুক্তরাষ্ট্র (USA), কানাডা।
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড — ইউরোপীয় উপনিবেশ থেকে গঠিত রাষ্ট্র।
কখনও ইসরায়েল ও জাপানকেও আধুনিক পশ্চিমা মূল্যবোধে অংশীদার হিসেবে ধরা হয়।

পশ্চিমা বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

১) গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা
পশ্চিমা বিশ্বে রাজনীতি পরিচালিত হয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে—
অর্থাৎ সরকার নির্বাচিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে।জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে, সরকারের সমালোচনা করতে পারে, এমনকি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনও করতে পারে।

২) ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া
প্রত্যেক মানুষ নিজের মত প্রকাশ, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, ও নিজের জীবনযাপন পদ্ধতি বেছে নেওয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্র তার ব্যক্তিগত জীবনে অযথা হস্তক্ষেপ করে না।

৩) বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রগতি
পশ্চিমা সমাজ বিজ্ঞান ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে জ্ঞান ও উন্নয়ন গড়ে তোলে। কোনো বিষয়কে তারা ধর্মীয় বা কুসংস্কারের চেয়ে যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে বিচার করে।যেমন,বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর জোর;প্রযুক্তি, চিকিৎসা, মহাকাশ, ও শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্ব।

৪) পুঁজিবাদী অর্থনীতি
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই উৎপাদন ও ব্যবসার মালিক হয়। সরকার সাধারণত অর্থনীতিতে সীমিত ভূমিকা পালন করে।এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবন ও লাভ অর্জনকে উৎসাহ দেওয়া হয়।যেমন,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা ও কোম্পানি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত।

৫) ধর্মনিরপেক্ষতা
পশ্চিমা বিশ্বে রাষ্ট্র ও ধর্ম আলাদা। রাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট ধর্মকে প্রাধান্য দেয় না; সব ধর্মের মানুষ সমানভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করে।

তবে বর্তমান সময়ে পশ্চিমা বিশ্বে বহুল প্রচলিত একটি ধারণা হলো ইসলামোফোবিয়া(ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি অযৌক্তিক ভয়, সন্দেহ বা ঘৃণাবোধ)ইসলামোফোবিয়ার শিকড় অনেক পুরনো — ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে শুরু করে উপনিবেশবাদ পর্যন্ত। তবে আধুনিক যুগে কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তি হয়।যেমন,

১) ইরান বিপ্লব (১৯৭৯) – ইসলামী শাসনের উত্থান পশ্চিমে উদ্বেগ তৈরি করে।

২) ৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা (২০০১, যুক্তরাষ্ট্র) – এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী War on Terror বা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মূলত এটি ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে।

৩) মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও শরণার্থী সংকট – ইউরোপে মুসলমান অভিবাসী প্রবাহের কারণে সামাজিক উত্তেজনা বাড়ে।

৪) মিডিয়া ও জনপ্রিয় সংস্কৃতি – অনেক চলচ্চিত্র, সংবাদ বা রাজনীতিক বক্তব্যে ইসলামকে হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

পশ্চিমা দেশসমূহে ইসলামোফোবিয়ার কিছু ঘটনা হলো:

১) ফ্রান্সে ২০০৪ সালে সরকারি স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়। ২০২১ সালে "সেপারেটিজম বিল" মুসলিম সংগঠনগুলোর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনে।

২) যুক্তরাজ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণাজনিত অপরাধ (hate crimes) বেড়েছে।ব্রেক্সিট পরবর্তী সময়ে ইসলামবিরোধী মন্তব্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩) যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ এর পর মুসলমানদের উপর নজরদারি, বিমানবন্দরে হয়রানি, ও "Muslim Ban" (ট্রাম্প আমলে) চালু হয়।

কিছু গবেষণালব্ধ তথ্যেও ইসলামোফোবিয়ার বিষয়টি স্পষ্ট -

Pew Research Center (2020) অনুসারে,পশ্চিমা বিশ্বের ৫০% মানুষ মনে করেন "ইসলাম ও পশ্চিমা মূল্যবোধ অসামঞ্জস্যপূর্ণ।"

EU Agency for Fundamental Rights (2019) অনুসারে, ইউরোপীয় মুসলমানদের ৩৯% কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার।

FBI Hate Crime Data (USA, 2022) অনুসারে, ধর্মীয় ঘৃণার ১০–১৫% ঘটনার লক্ষ্য মুসলমান সম্প্রদায়।

৬) শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আইনব্যবস্থায় ইউরোপীয় প্রভাব

পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আইন ইউরোপীয় চিন্তা, দর্শন ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

অধ্যায় ৬:মুসলিম ও পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর তুলনা

পরিবার সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক। এটি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে। মুসলিম ও পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক কাঠামো ও মূল্যবোধে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম পারিবারিক কাঠামো গড়ে উঠেছে ইসলামের আদর্শ, কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে। অপরদিকে পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামো গড়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতাবাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে।

- ইসলামে পরিবারকে শুধু সামাজিক নয়, বরং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়। মুসলিম সমাজে বিবাহকে ইবাদত ও নৈতিকতার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো পবিত্রতা রক্ষা, বংশধারা সংরক্ষণ ও পারস্পরিক দায়িত্ব পালন। অন্যদিকে পশ্চিমা সমাজে বিবাহকে একটি সামাজিক বা আইনি চুক্তি হিসেবে দেখা হয়, যেখানে ব্যক্তিগত সুখ, ভালোবাসা ও স্বাধীনতাই মুখ্য বিষয়। মুসলিম সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ অনুমোদিত হলেও তা অপছন্দনীয় ও শেষ উপায় হিসেবে বিবেচিত; কিন্তু পশ্চিমা সমাজে এটি বেশ সাধারণ ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

- মুসলিম পরিবার সাধারণত সম্প্রসারিত পরিবারব্যবস্থার অনুসারী, যেখানে দাদা-দাদি, আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মানের মাধ্যমে বসবাস করে। অপরদিকে পশ্চিমা সমাজে একক পরিবার বেশি প্রচলিত, যেখানে কেবল পিতা-মাতা ও সন্তানরা বসবাস করে, এবং বয়স্করা প্রায়ই আলাদা থাকেন বা বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থান করেন।

- লিঙ্গভূমিকা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রেও পার্থক্য সুস্পষ্ট। মুসলিম সমাজে পুরুষকে পরিবারপ্রধান, উপার্জনকারী ও রক্ষক হিসেবে দেখা হয়, আর নারীকে গৃহপরিচালনা, সন্তান লালন-পালন ও ধর্মীয় শিক্ষাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বলা হয়। তবে ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা সমান, দায়িত্ব ভিন্ন। পশ্চিমা সমাজে নারী-পুরুষ উভয়েই সমান অধিকার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, ফলে উভয়েই কর্মজীবন ও পারিবারিক সিদ্ধান্তে সমান ভূমিকা রাখে।

- নৈতিকতা ও সন্তান প্রতিপালনের দিক থেকেও দুটি সমাজে বড় পার্থক্য দেখা যায়। মুসলিম পরিবারে কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়, যেখানে শৃঙ্খলা ও আল্লাহভীতি গুরুত্ব পায়। কিন্তু পশ্চিমা সমাজে

সন্তানদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধ শেখানো হয়, যেখানে ধর্মীয় শাসন তুলনামূলকভাবে কম।

- সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রেও মুসলিম পরিবার অধিক ঐক্যবদ্ধ ও পারস্পরিক নির্ভরশীল, আর পশ্চিমা সমাজ তুলনামূলকভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মুসলিম সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও যত্নের একটি গভীর সংস্কৃতি রয়েছে, কিন্তু পশ্চিমা সমাজে অনেক সময় প্রবীণরা পরিবারের বাইরে একাকী জীবনযাপন করেন।

অর্থাৎ, মুসলিম পারিবারিক কাঠামো ধর্মীয় মূল্যবোধ, পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ব ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত; অন্যদিকে পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামো ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমঅধিকার ও আত্মতৃপ্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তাই মুসলিম পরিবার সমাজে ঐক্য, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি রক্ষা করে, যেখানে পশ্চিমা পরিবার আধুনিকতা ও স্বাধীনচেতা জীবনধারার প্রতিফলন ঘটায়।

তবে বর্তমানে মুসলিমদের মধ্যে পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম পরিবার পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে গঠিত হয়ে থাকে অর্থাৎ একক পরিবার গঠন করে থাকে। এমনকি বর্তমানে মুসলিম পরিবারের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদও একটি অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায় ৭: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার

পশ্চিমাদের কূটচালে মুসলিমরা আজ পর্যুদস্ত।বিশ্বায়নের এই যুগে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা তাদের জন্য আরও সহজ হয়ে উঠেছে। সুদূর অতীত কাল থেকেই তারা তাদের সংস্কৃতি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে আসছে এবং এখনও করছে। অর্থাৎ, বিশ্বব্যাপী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে তারা এবং মুসলিম তথা পুরো বিশ্বকে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়ে তোলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আর তারা তাদের এই লক্ষ্যে প্রায় সফল বলা যায়। মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ অংশই নানাভাবে তাদের অনুকরণ করছে এখন।

সাধারণত বলা যায়, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার বলতে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাভিত্তিক জীবনধারা, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ, প্রযুক্তি, ভাষা, পোশাক, বিনোদন এবং সামাজিক আচরণের বৈশ্বিক বিস্তৃতি বোঝায়। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতি বিশ্বের প্রায় সব অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে।

প্রসারের কারণসমূহ:

১) বিশ্বায়ন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি, ও যোগাযোগের মাধ্যমে দেশগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েছে, যা পশ্চিমা সংস্কৃতির দ্রুত বিস্তার ঘটিয়েছে।

২) গণমাধ্যম ও ইন্টারনেট

পশ্চিমা চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স, ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে পশ্চিমা জীবনধারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

৩) শিক্ষা ও অভিবাসন:

অনেক শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী পশ্চিমা দেশে পড়াশোনা বা কাজ করতে গিয়ে তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করছে ও দেশে ফিরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর প্রচার করছে।

৪) বাণিজ্য ও প্রযুক্তি:

পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পণ্য (যেমন: Apple, Nike, McDonald’s) কেবল অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিস্তার করছে।

৫) ঔপনিবেশিক ইতিহাস:

ব্রিটিশ, ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের যুগে পশ্চিমা ভাষা, শিক্ষা ও আইনব্যবস্থা অনেক দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এখনো টিকে আছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি কিছু ইতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। তবে সেগুলো বিচ্ছিন্ন করে কেবল ভালোটা গ্রহণ করা তেমন সহজ বিষয়ও নয়।পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রসার একদিকে যেমন আধুনিকতা ও উন্নয়নের

বার্তা নিয়ে এসেছে, অন্যদিকে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। তাই প্রয়োজন—পশ্চিমা সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক গ্রহণ করা এবং নিজস্ব সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও মর্যাদা রক্ষা করা।

অধ্যায় ৮: পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির তুলনা

বর্তমান বিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বের সামনে মুসলিমদের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরাজয়ের কারণ হচ্ছে, আমাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ তথা ইসলামী শরী'আত এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, আচার-আচরণ ও তাদের শরী'আত সম্পর্কে কোনো জ্ঞান অর্জন না করে এবং কোনো বাছ-বিচার ও যাচাই বাছাই ছাড়াই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। বিশেষ করে নারীদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অনুসরণ করছি, অথচ আমাদের শরী'আত ও তাদের শরী'আতে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের বেলায় যে সমস্ত আচরণ করা হচ্ছে এবং পুরুষের মতো করে বিনা বাধায় বিনা শর্তে নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে বের করে দেয়া হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় পরিবারকে ভাঙ্গন ও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং নারীদের ইজ্জত সম্মান ও সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হেনে তাদের ব্যভিচার ও দেহ-ব্যবসার প্রতি অনুপ্রাণিত করছে। পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের পণ্য হিসেবেই কাজে লাগানো হচ্ছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একে অপরের বিপরীত বলা যায়। ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ইসলাম ধর্মের পালনীয় বিধি-বিধানের উপর ভিত্তি করে। অপরদিকে পশ্চিমে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে মানুষের মনগড়া কিছু নিয়ম বা ভিত্তির ওপরে যেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। উভয় সংস্কৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু পার্থক্য হলো-

- আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, নবুয়ত, কিয়ামত ও পরকাল—এসব মৌলিক বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসরণ বাধ্যতামূলক।

  আর পশ্চিমা সংস্কৃতি খ্রিষ্টান ধর্ম দ্বারা ঐতিহাসিকভাবে প্রভাবিত হলেও বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতাই এখানে মূল দর্শন।

- ইসলামী সংস্কৃতিতে ন্যায়, সততা, পরহেজগারি, দয়া, সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের ওপর জোর দেয়।

  পশ্চিমা সংস্কৃতিতে নৈতিকতা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

- ইসলামি সংস্কৃতিতে পরিবারকে সমাজের মূল একক হিসেবে দেখে। বিবাহকে পবিত্র চুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং পিতা-মাতা ও সন্তানদের পারস্পরিক দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারিত।

  পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পারিবারিক বন্ধন তুলনামূলকভাবে শিথিল। সহবাস, একক অভিভাবক পরিবার, ও বিবাহবিচ্ছেদ সাধারণ বিষয়।

- ইসলামি সংস্কৃতি নারীকে সম্মান ও মর্যাদার স্থানে রাখে। তার অধিকার (মাহর,

উত্তরাধিকার, শিক্ষা, সম্পত্তি) কুরআনে নির্ধারিত। পোশাক ও আচরণে শালীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়।

পশ্চিমা সংস্কৃতি নারী-পুরুষ সমতা ও স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাস করে। পোশাক ও জীবনযাপনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

- ইসলামি সংস্কৃতিতে ন্যায়ভিত্তিক শাসন, শূরা (পরামর্শ) ও আল্লাহভীতি—এগুলো শাসনের মূলনীতি। রাষ্ট্র ও ধর্ম পরস্পর সম্পর্কিত।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। ধর্ম রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

- ইসলামি সংস্কৃতিতে সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য সবকিছুতেই নৈতিকতা ও ঈমানের সীমারেখা রয়েছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বিনোদন, ব্যক্তিগত সুখ ও ভোগবাদী প্রবণতা বেশি। জীবনধারায় বস্তুবাদ দৃশ্যমান।

- ইসলামি সংস্কৃতিতে জ্ঞান অর্জনকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং নৈতিক উন্নয়নই এর লক্ষ্য।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও যুক্তিবাদিতা প্রাধান্য পায়, তবে নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কম।

- মা ও মাতৃত্ব এবং পরিবারকে ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । তাদেরকে সকল বিচ্ছেদ, ভাঙ্গন এবং বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও প্রভাবমুক্ত করে সামাজিক উন্নয়নের জন্য মা ও পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্ন।

অধ্যায় ৯: পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমানে মুসলিমদের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয় । তাই পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যায়। যেমন-

১) সাংস্কৃতিক প্রভাব

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা শালীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। যেমন -ফ্রান্সে আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে গিয়ে মুসলিমরা নিজেদের স্বকীয়তা হারাচ্ছে।

২) বিশ্বব্যাপী জাহেলিয়াতের প্রসার

বর্তমানে এমন কোন শক্তিশালী জাতি, সম্প্রদায় কিংবা দল নেই, যারা পাশ্চাত্য জাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে আকিদাগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য পোষণ করে এবং তাদের জাহিলি দর্শন ও বস্তুবাদী জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে।

৩) পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব

নব্য সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি মূলত রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ বা আগ্রাসন যা আফগানিস্তান ও ইরাকে দেখা গেছে। নব্য সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যারা কোনো আন্তর্জাতিক আইন মানে না এবং সকল ক্ষেত্রে যারা বিশ্বকে নিজেদের মতো শাসন করতে চাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের ফলে মুসলিম বিশ্ব ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

৪) অর্থনৈতিক প্রভাব

অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের চটকদার স্লোগানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ যাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক দাশের পরিণত হয় তার সব রকম কৌশল উদ্ভাবন করেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এমনকি এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন হওয়ায়, নিজেদের সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলো তাদের দাসে পরিণত হয়েছে।

৫) বুদ্ধিভিত্তিক প্রভাব

বুদ্ধিভিত্তিকভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম কে সন্ত্রাসী বলে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। যেমন ৯/১১ ঘটনার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসী বিরোধী যুদ্ধ কার্যক্রম পরিচালনা। যেখানে মূল টার্গেট হলো মুসলিম বিশ্ব বা মুসলমানরা। টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদ ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে আক্রমণ করার একটি হাতিয়ার মাত্র।

৬) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব

একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মুসলিমদের প্রাধান্য ছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের এক্ষেত্রে অমনোযোগিতা ও পতন এবং অন্যদিকে ইউরোপে জাগরণের সূত্র ধরে পশ্চিমা জগত মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানের সূচনা করে। আর বর্তমানে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভাবনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে।

৭) মিডিয়ার উপর পশ্চিমা কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জ

বিশ্বব্যাপী প্রচারিত মিডিয়া গুলোর উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্ব তথ্য ও মিডিয়া জগতে এক ব্যাপক জাল বিস্তার করেছে। তারা তথ্য বিকৃতি ও তথ্য প্রচারে কাজ করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। হলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতি সহজেই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে।

৮) অশ্লীল শিল্পকলার প্রসার

পৃথিবীতে অশ্লীলতা আগেও ছিল। কিন্তু অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি আজকের মত গণরূপ পাইনি। বর্তমানে এগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকলা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে ধ্বংস হচ্ছে যুব চরিত্র, বাড়ছে মাদকাসক্তি, ছড়াচ্ছে মরণঘাতী রোগ।

৯) বিশ্বব্যাপী বাজার দখল ও পুঁজিবাদের আধিপত্য বিস্তার

মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী চক্র সবসময়ই মুসলিম বিশ্বের বাজার দখলের চেষ্টা চালিয়েছে। কমিউনিজমের পতনের পর এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হয়েছে। এখন চলছে বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। ফলের মুসলিম বিশ্ব আজ সামান্য পণ্যের জন্যও তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে।আবার পুঁজিবাদের বিপুল শক্তি ও উপকরণ ব্যয় হচ্ছে ইসলামেরই উত্থান ঠেকানোর জন্য।

১০) নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে উপস্থাপন ও নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে উপস্থাপন

ইসলাম নারীকে অনেক সম্মানিত করেছে। তারা সম্মানিত। পশ্চিমা বিশ্ব এর বিরোধিতা করে প্রচার মাধ্যম সমূহের মাধ্যমে নারীকে অর্ধনগ্ন আকারে উপস্থাপন করে আকর্ষণীয় ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে। এমনকি কোন সাধারণ পণ্য মার্কেটিং এর জন্যও নারীদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে সমাজে যৌনাচার, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামী মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারা নারীদের পর্দা শিথিল করে,নিষিদ্ধ করে অথবা এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। আবার তথাকথিত

নারী ক্ষমতায়নের নামে তাদের ব্রেনওয়াশ করে থাকে। সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নারীদের প্রদর্শনী করা হয়। এমনকি অনেক মুসলিম দেশের মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করে এবং মুসলিম রাষ্ট্র এর আয়োজকদের ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে ইসলামের শালীনতার বিধানকে ভূলুণ্ঠিত করতে দ্বিধা করে না।

১১) পারিবারিক বন্ধন ছিন্নকরণ

পশ্চিমা সামাজিক প্রথার প্রভাবে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতেও পারিবারিক প্রথায় ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোতেও গড়ে উঠেছে পশ্চিমা ধাঁচের বৃদ্ধাশ্রম।

১২) পশ্চিমা গণতন্ত্রের বিকাশ

সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি মুসলিম বিশ্বে তাদের স্বার্থনুকূল গণতন্ত্র চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় অব্যাহত ভাবে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। কোন মুসলিম দেশে ধর্মনিরপেক্ষ দল নির্বাচিত হলে তাদের পশ্চিমা শক্তি সহায়তা করে। কিন্তু তাদের স্বার্থের বিপরীতে কোন ইসলামী দল নির্বাচিত হলে তাদের পতন ঘটানোর জন্য সব রকম ষড়যন্ত্র ও প্রচারণা চালায় তারা। পশ্চিমারা গোটা বিশ্বকে এমন এক পল্লীতে রূপান্তর করার চেষ্টা করছে যার নেতৃত্বে রয়েছে মার্কিনীরা এবং যার কর্তৃত্বে রয়েছে ইহুদিরা।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুইটি কারণে। একটি হলো ধর্মজ্ঞানের অভাব, অপরটি হল অনৈক্য। তাদের বর্তমান অধঃপতনের অন্যতম আরেকটি কারণ হলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুসরণ। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মোকাবেলা করতে হলে মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈমানের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদেরও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

অধ্যায় ১০:পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব কাটিয়ে উঠার উপায়

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের সমাজ, পারিবারিক জীবন ও চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। তবে ইসলামী ও দেশীয় মূল্যবোধ রক্ষার জন্য এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমত, এর জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা প্রদান, নামাজ-রোজা ও নৈতিক আচরণের চর্চা তাদের চরিত্রকে দৃঢ় করে তোলে।

দ্বিতীয়ত, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে হবে। নিজের সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিলে জাতির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় অটুট থাকবে।

তৃতীয়ত, ইসলামী পারিবারিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসার মাধ্যমে পরিবার দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থত, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি; ইসলামি মূল্যবোধসম্পন্ন অনুষ্ঠান, ভিডিও তৈরি করে তরুণদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, শিক্ষাব্যবস্থায় এমন পাঠ্যক্রম থাকা উচিত, যেখানে ইতিহাস, ধর্মীয় জ্ঞান ও নিজস্ব সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি সমাজে আলেম, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে, যাতে তারা তরুণ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন।

সবশেষে, প্রযুক্তিকে নেতিবাচক নয়, বরং ইতিবাচকভাবে—ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রচারের কাজে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সচেতনতা, আত্মমর্যাদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ থেকে দূরে থেকে একটি আদর্শ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন,ইসলামি সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজ গঠন করতে পারব।

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব না হলেও, সচেতনতা, আত্মমর্যাদা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণ ও ইতিবাচকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব। ইসলামী আদর্শে গঠিত সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারলে জাতির আত্মপরিচয় টিকে থাকবে।ইনশাআল্লাহ। মা ও মাতৃত্ব এবং পরিবারকে ইসলামে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমা সভ্যতায় যে বিষয়ের কোনো মূল্য নেই। তাদেরকে সকল বিচ্ছেদ, ভাঙ্গন এবং বিভ্রান্তি থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও প্রভাবমুক্ত করে সামাজিক উন্নয়নের জন্য মা ও পরিবারকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও ভিন্ন।এ জন্য আমাদের উচিৎ এবং কর্তব্য হচ্ছে নারী এবং পুরুষ উভয়ই সমাজের অংশীদার হিসেবে প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মসংস্থান ও

উপার্জনের যথাযথ ব্যবস্থা করা। যাতে সঠিকভাবে আমাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা যায়।নারীর বেলায় যেহেতু মা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন ও সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন হিসেবে মনে করা হয়। তাদের সে দায়িত্ব পালনের যথার্থ ব্যবস্থা করা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সুতরাং এ নিষ্প্রাণ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হলে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত-পরিচর্যা এবং নারী ও পরিবার সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতি আজ সর্বস্তরে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং উপনিবেশ ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার, তেমনিভাবে ধাঁধা লাগানো অত্যাধুনিক নানা আবিষ্কারে আর বিজ্ঞাপনে দিশেহারা, সে জাতি কীভাবে তাদের শিশুর সেই হারানো অদৃশ্য শক্তিকে ফিরে পাবে এবং নতুন প্রজন্ম থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারবে। এবং তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারবে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটিই। তা হচ্ছে, পারিবারিক ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক ভূমিকার মাধ্যমে সঠিকভাবে শিশুর লালন-পালন ও তার পরিচর্যা করে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলে এক পর্যায়ে জাতি এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে।

ইসলাম হলো complete code of life.একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে তার মৃত্যু পর্যন্ত তথা সারা জীবন কিভাবে কাটানো উচিত তার দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল বিষয়ের বিধি-বিধানের রয়েছে ইসলামে।ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে ধারণ করতে পারলে, অন্য কোন সংস্কৃতির অনুসরণ সম্ভব নয়। কেননা ইসলামকে জানলে ও মানলে,তখন স্পষ্টতই ইসলামের সর্বৎকৃষ্টতা অনুধাবন করা সম্ভব। ইসলামী সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃতির চর্চা বা অনুসরণ করতে পারে না। তাই আমাদের উচিত নিজেদের জীবনকে প্রকৃত ইসলামিক সংস্কৃতির আদলে গড়ে তোলা।

References

- Brown, Roy I.; Brown, Ivan (২০১8)। "Family Quality of Life"।
- জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের, আদর্শ মুসলিম পরিবার।
- হান্ট, লিন ; মার্টিন, থমাস আর .; রোজেনওয়েইন, বারবারা এইচ .; স্মিথ, বনি জি. (২০১৫)। দ্য মেকিং অফ দ্য ওয়েস্ট: পিপল অ্যান্ড কালচারস ।
- পিটার এন. স্টার্নস, বিশ্ব ইতিহাসে পশ্চিমা সভ্যতা, বিশ্ব ইতিহাসের থিম, রাউটলেজ, ২০০৮,পৃষ্ঠা ৯১-৯৫।
- Bavaj, Riccardo (21 নভেম্বর 2011)।""দ্য ওয়েস্ট": একটি ধারণাগত অন্বেষণ" ।
- পিয়ার্স, জেসন ই. (২০১৬)। হোয়াইটনেস অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য আমেরিকান ওয়েস্ট । ইউনিভার্সিটি প্রেস অফ কলোরাডো। পৃষ্ঠা ১২৩– ১৫০।
- কটার, অ্যান-মেরি মুনি (২০১৬)। সংস্কৃতি সংঘর্ষ: জাতিগত বৈষম্যের উপর একটি আন্তর্জাতিক আইনি দৃষ্টিভঙ্গি । রাউটলেজ। পৃষ্ঠা ১২।
- Spielvogel, Jackson J.(2006)। পাশ্চাত্য সভ্যতা ।
- আবু হামেদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযালি (রহ.),হুজ্জাতুল ইসলাম (মূল)। অনুবাদক,কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক,আল্লাহকে পেতে চাইলে(অনুবাদ)।
- কিতাবুল ফিকহ(Islamic Online Madrasah-IOM)
- Muhammed Ali Hossain,Sayed Rashed Hasan Chowdury,Western Culture Aggression in Muslim Society.

1.রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (১৯৯৭)। একুশে ফেব্রুয়ারি সকল ভাষার কথা কয়। সময় প্রকাশন। পৃ. ২৬।

2.John Berger, Peter Smith Pub. Inc., (1971) Ways of Seeing.

3.Tylor,Primitive Culture, Vol:1,1871.